একক ৩ □ নতুন কূটনীতি

গঠন

৩.৩.০ উদ্দেশ্য

৩.৩.১ প্রস্তাবনা

৩.৩.২ প্রারম্ভিক কথা

৩.৩.৩ উনিশ শতকে কূটনীতির বৈশিষ্ট্য

৩.৩.৪ উনিশ শতকের কূটনীতিতে গোপনীয়তার সবিশেষ অভ্যুদয়

৩.৩.৫ নয়া কূটনীতির জন্ম

৩.৩.৬ খোলা কূটনীতি নিয়ে মর্গেনথোর মত

৩.৩.৭ নয়া কূটনীতি কি বিদ্রোহ?

৩.৩.৮ পুরানো কূটনীতি বনাম নয়া কূটনীতি : বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক পর্যালোচনা

৩.৩.৯ নয়া কূটনীতির মার্ক্সবাদী সমালোচনা

৩.৩.১০ সারাংশ

৩.৩.১১ অনুশীলনী

৩.৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৩.৩.০ উদ্দেশ্য

১৮৭০-এর দশক থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর ১৯১৮ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি **উড্রো উইলসনের** (Woodrow Wilson) **চৌদ্দ** দফা শর্ত ঘোষণার সময় পর্যন্ত ইউরোপীয় মহাদেশে কূটনীতির রূপ বদলাচ্ছিল। এইরূপ বদলানোটা ছিল স্বাভাবিক। বিগত পঞ্চাশ বছরে মহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। জার্মানি ও ইটালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। রাজতান্ত্রিক রক্ষণশীলতা পরাভূত হয়েছে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের দ্বারা। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লব এসেছে। ইংল্যান্ডে বিশেষ করে এক বিরাট শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। রাশিয়াতে সার্ফরা মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু সমাজ শক্তিশালী হয়নি, রাষ্ট্র সংহত হতে পারেনি। নিহিলিজম্ (Nihilism) নামে এক সংহারের দর্শন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার উপায়হীন জারতন্ত্র ক্রমশ বিপর্যয়ের মধ্যে তলিয়ে যেতে শুরু করেছিল। এদিকে ইউরোপে অটোম্যান তুর্কী সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়ার ফলে বলকান অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদ বাড়ছিল। অখিল স্ল্যাভ (Slav) চেতনা (Pan-Slavism) ধীরে ধীরে ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল। যেহেতু অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য ছিল বহুজাতিক সাম্রাজ্য আর সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ স্ল্যাভরা থাকত সেহেতু অখিল স্ল্যাভবাদ (Pan-Slavism) অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। এই সমস্ত কিছু নিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছিল। এক দেশের সঙ্গে আরেক

দেশের সম্পর্কের মধ্যে নানা টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির গার্হস্থ্য রাজনীতি যেমন বদলাচ্ছিল বৈদেশিক রাজনীতি, আন্তর্দেশিক বোঝাপড়া যাকে আমরা কূটনীতি বলি। আমরা দেশের সাথে দেশের এই নতুন বোঝাপড়ার ইতিহাস পড়ব। আমাদের উদ্দেশ্য হবে এটা বোঝা যে কূটনীতি ইতিহাসের একটি আঙ্গিক হিসাবে কাজ করে। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের পর সমস্ত পৃথিবীটা আস্তে আস্তে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের (East and West) বিরোধ একটা প্রতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছিল। এর মধ্যে কূটনীতি নামক ইতিহাসের একটা বড় আঙ্গিক কেমন করে বদলাচ্ছিল তা না জানলে মানবসমাজের আন্তর্জাতিক দেওয়া নেওয়ার প্রেক্ষিতটা আমরা বুঝতে পারব না। সেটা বোঝাই আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য। আরেকটি কথাও এর সঙ্গে বোঝা দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কূটনীতির বেশির ভাগটাই ছিল গোপন আলাপ-আলোচনার ধারা। এই গোপনীয়তা, শিবিরে শিবিরে সন্দেহ ও সংঘাত, আড়ালে আড়ালে সমর-সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুতি বিশ্বযুদ্ধকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। এর থেকে বের হয়ে আসার একটা ধারাও ছিল। তার মধ্যে কি নতুন কোন কূটনীতির আভাস আমরা দেখতে পাই? এ আভাস কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই দেখা দিয়েছিল? সে আভাস কি কোনদিন পরিণতি লাভ করেছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব এই এককের পাঠশালায়? এই খোঁজার মধ্য দিয়ে জাগবে ইতিহাসের নতুন বোধ। এই বোধকে জাগানোই এই এককের উদ্দেশ্য।

৩.৩.১ প্রস্তাবনা

বিবদমান দুই দেশের মধ্যে একটি সম্পর্ক হল লড়াইয়ের সম্পর্ক যার একটি চরম ও উৎকট পরিণতি হতে পারে যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ একটি অভিশাপ। তা মানবসমাজের পক্ষে কোনদিন মঙ্গলের হয়নি, হতেও পারেনা। তার কারণ যুদ্ধ একটি আপৎকালীন ঘটনা, মানুষের লোভ-ঈর্ষা-দ্বেষ ও দম্ভের এক চরম পরিণতি। তাই যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখতে হয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, লোভ ও ঈর্ষাকে সংযত করে, দ্বেষ ও দম্ভকে প্রশমিত করে। কূটনীতি হল একটি আলাপ-আলোচনা, একটি দেশের মৌলিক স্বার্থ ও চাহিদার সাথে অন্যদেশের মৌলিক স্বার্থ ও চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান। প্রত্যেক দেশ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শান্তি চায়, অর্থাৎ চায় আক্রমণ থেকে অব্যাহতি (immunity)। তার জন্য তার দরকার হয় মিত্রশক্তির (ally)। শান্তি, মৈত্রী ও আক্রমণ থেকে অব্যাহতি এই তিনকে সামনে রেখে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার রূপে কাজ করে কূটনীতি।

ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে কূটনীতির প্রথম উদ্ভব হয়েছিল 'ইতিহাসের ঊষাকালে' ('at the dawn of history') যখন নর-বানররা (anthropoid) গুহাবাসী হয়ে শিকার-সন্ধানী হতে শুরু করেছিল তখন থেকে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে এক একটি এলাকার নর-বানর গোষ্ঠীর শিকারের এলাকা ভাগ করে নেওয়া উচিত আপসের মাধ্যমে, লড়াই আর পারস্পরিক হত্যার মধ্য দিয়ে নয় ["There came a stage when the anthropoid apes inhabiting one group of caves realised that it might be profitable to reach some understanding with neighbouring groups regarding the limits of their respective hunting territories"—Harold Nicolson, The Evoution of Diplomatic Method.]

এইভাবে আপসের বোধ থেকে কূটনীতির সূত্রপাত। আর কূটনীতির প্রথম নীতি—প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিকে হত্যা করা যাবে না। স্থির হল তখনই যখন নর-বানর বা আদিম মানুষ বুঝতে পারল যে আপস ও সন্ধির জন্য এগিয়ে আসা বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধিকে হত্যা করলে কোন লাভজনক পরিস্থিতিতে উপনীত হওয়া যায় না। ["It must have been soon realised that no negotiation could reach a satisfactory conclusion of the emissaries of either party were murdered on arival —ঐ] এর থেকে জন্ম নিল সেই নীতি—দূত

অবধ্য। প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিকে হত্যা করা যাবে না। এইভাবে যে নীতির প্রতিষ্ঠা হল তা হল কূটনৈতিক অব্যাহতির নীতি ["Thus the first principle to become finally established was that of diplomatic immunity"—ঐ] এরপর যখন ধর্মের আবির্ভাব ঘটল তখন কূটনীতিকে ধর্মের সাথে বেঁধে দেওয়া হল। ধর্মের স্বার্থরক্ষা তখন কূটনীতির লক্ষ্য হল। ধর্মের অনুশাসনও কূটনীতির মধ্যে আরোপিত হল আর একটা নৈতিকতার আবরণের মধ্যে এনে যুদ্ধের ভয়াবহ নৃশংসতাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা হল। সে চেষ্টা আজও চলেছে, অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে, যেমনটি আমরা দেখি বর্তমান যুগের জেনেভা কনভেনশনে (Geneva Convention)।

কূটনীতির সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক ভাষ্যকার হ্যারল্ড নিকলসন (Harold Nicolson) বলেছেন যে ইউরোপে কূটনীতির বিবর্তনে তিনটি ধারা আছে—গ্রীক ও রোমান ধারা, ইটালীয় ধারা, ফরাসী ধারা। সনাতন কাল থেকে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কোন স্বতন্ত্র ব্রিটিশ বা জার্মান বা রুশ ধারা ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেননি। গ্রীক ও রোমানরা প্রথম আন্তর্জাতিক দেওয়া নেওয়ার কলকব্জা ("apparatus of international intercourse') তৈরি করেছিল। পরভূমে স্থায়ীদূত বা কনসাল (consul) নিয়োগের ব্যবস্থা তারাই করেছিল। তারাই এই প্রথা চালু করেছিল যে আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনার থেকে যদি কোন চুক্তির (Treaty) উদ্ভব হয় তবে তা পাষাণ ফলকে খোদাই করে রাখা হবে।

রোমানরা কোনদিন পেশাদারী কূটনীতিকে (professional diplomacy) বুঝতে পারেনি, কারণ তাদের অখণ্ড ও বৃহৎ সাম্রাজ্যের বড়মাপের প্রতিপক্ষ ছিল না। ফলে আন্তর্জাতিক দেওয়া-নেওয়া লুকোচুরি কিছু ছিল না। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। আরম্ভ হল একদেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে অন্য দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্যবিধান (adjusting rival claims), জাতীয় নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করা, শত্রুকে এড়িয়ে যাওয়া বা প্রশমিত করার প্রয়াস, বন্ধু খোঁজার তৎপরতা। এইবার কূটনীতি শাণিত হল। গ্রীকদের নগররাষ্ট্র (City-state) আর মধ্যযুগের ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্র (national state) এক নয়। রোমানদের অখণ্ড সাম্রাজ্যের অটল সার্বভৌমত্ব গ্রীক নগররাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণতা ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তাকে ঢেকে দিয়েছিল। সেই সার্বভৌমত্ব যখন তলিয়ে গেল, যখন সেই টুকরো হয়ে যাওয়া সার্বভৌমত্বের ভগ্ন অংশের আধার হয়ে রইল জাতীয় রাষ্ট্রগুলি তখন কূটনীতির রূপ বদলাতে লাগল। পোপ ঐতিহ্য ক্ষমতার জন্য লড়াইতে নামলেন, সম্রাট ধর্মীয় নেতার মহিমা কেড়ে দিতে চাইলেন; পবিত্র রোমান সম্রাট (Holy Roman Emperor) আর ঐতিহ্য ঐক্যের প্রতীক রইলেন না, খ্রীষ্টতন্ত্রের সর্বজনীন সংহতি (Universal Unity of Christendom) ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এবার জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে জাতীয় রাষ্ট্রের দেওয়া-নেওয়ায় অনেক জটিলতা-কুটিলতা দেখা দিল। কূটনীতি এখন অনেক কৌশল, বুদ্ধি, গণনা ও আদান-প্রদানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কূটনীতি হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্র পরিচালনার একটি শাখা (diplomacy became one of the branches of statesmanship)। ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি শহরগুলি উদীয়মান অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক ছলাকলা আয়ত্ত করে ফেলেছিল। তারাই প্রথম পররাষ্ট্র নীতির পরিচালনার জন্য সরকারের একটি বিশেষ দপ্তর খুলেছিল। তাদের কাছ থেকে কূটনীতির রীতি ও নীতি শিখেছিল ভেনিস (Venice)। আর ভেনিসের কাছ থেকে শিখেছিল সারা ইউরোপ—প্রথমে ইটালীর ছোট ছোট রাজ্যগুলি এবং পরে ইটালীর বাইরে বড় রাজ্যগুলি। আর ভেনিসের সবচেয়ে পরিপূর্ণ কূটনৈতিক শিক্ষা এসেছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য থেকে ("It was the Byzantines who taught diplomacy to Venice; it was the Venetians who set the pattern for the Italian cities, for France and Spain, and eventually for all Europe"–Harold Nicolson)। বাইজানটাইনদের কাছ থেকে ইটালীয়রা শিখেছিল কূটনীতিতে প্রোটোকল ও আনুষ্ঠানিকতা (protocal and ceremonials)। আর তার সঙ্গে তারা মিশিয়েছিল তাদের কূটনীতি—ছোট ছোট নগররাষ্ট্রের ক্ষুদ্র স্বার্থের লড়াই, তার ছলাকলা। দীর্ঘস্থায়ী নীতির মূল্য ("value of long-term policies) কিংবা ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের

বিশ্বাসভাজন হওয়ার নীতির ("policy of the gradual creation of confidence") গুরুত্ব তারা বুঝত না। রোমানদের ছিল বিরাট সাম্রাজ্য, বিরাট প্রতিপত্তি, দুর্ধর্ষ প্রভাব। সেখানে ক্ষুদ্রস্বার্থের কূটনীতি, স্বল্পসময়ের মুনাফা (short-term gain) ভিত্তিক আদানপ্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক ছলাকলা অনুপস্থিত ছিল। তা এল যখন বিরাট এবং অখণ্ড সাম্রাজ্যের ছত্রছায়া অপসারিত হল আর তার স্থানে দেখা দিল ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্র (national states) এবং আরও ছোট নগররাষ্ট্র (city-states)। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের সময় থেকে ক্ষুদ্রস্বার্থের কূটনীতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে ইটালীয় সঙ্কীর্ণ রাজনীতির মধ্যে তার পরিণতি লাভ করে ("Yet the diplomatic method that emerged from the fifteenth century was essentially an Italian Method"—Harold Nicolson)। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব থেকে পরিবর্তিত হয়ে ইটালীয়দের হাতে যে কূটনীতি আত্মপ্রকাশ করল তা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিরাট ঝুঁকি নেওয়ার খেলা, স্বল্পমেয়াদী মুনাফা আর প্রত্যক্ষ সাময়িক স্বার্থের প্রতিপালনমাত্র যা পরিচালিত হত উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আর সেখানে ধূর্ত কুটিল ও নির্দয় মনেরই সমন্বয় ঘটত ("To them the art of negotiation became a game of hazard for high immediate states, it was conducted in an atmosphere of excitement, and with the combination of cunning, recklessness and ruthlessness"—Harold Nicolson)।

৩.৩.২ প্রারম্ভিক কথা

ওপরের আলোচনা পাঠ করলেই বোঝা যাবে যে সেটি হচ্ছে মূলতঃ হ্যারল্ড নিকোলসনের (Harold Nicolson) দেওয়া কূটনীতির বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা। হ্যারল্ড নিকোলসনের ইদানীংকালের কূটনীতির বিবর্তনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রতীচ্য ভাষ্যকারদের মধ্যে একজন এবং প্রাচীন কূটনীতি (Old diplomacy) এবং নয়া কূটনীতির (New diplomacy) পার্থক্যের আলোচনায় তাঁর মতটিকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। বলা যেতে পারে যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কূটনীতির ধারা হল প্রাচীন কূটনীতির ধারা। গ্রীক, রোমান ও ইটালীয় ধারার সাথে ফরাসী কূটনীতিক চিন্তা মিশে এই ধারাকে সৃষ্টি করেছিল। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার অনেকদিন পরে ইউরোপে দুটি শক্তি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল—একটি হল প্যাপাসি (Papacy) বা পোপতন্ত্র, আরেকটি হল হোলি রোমান এম্পেরর (Holy Roman Emperor) বা পবিত্র রোমান সম্রাটের শাসনতন্ত্র। ফ্রান্সের সম্রাট একাদশ লুই (Louis XI) ফ্রান্সকে একটি তৃতীয় শক্তিতে পরিণত করেন। ১৪৬১ থেকে ১৪৮৩ সালে তাঁর রাজত্বের মধ্যে তিনি ইউরোপের কূটনীতিতে বিপর্যয়কর পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল "সাফল্য যাঁর আছে সম্মান তাঁরই" ("he who has success has honour")। নীতি, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, অঙ্গীকার এগুলির কোন গূঢ় মূল্য নেই। স্বার্থের প্রয়োজনে চুক্তি করা যায়, স্বার্থের প্রয়োজনে তা ভাঙ্গা যায়। ধূর্ত ও বিবেকহীন (cunning and unscrupulous) এই মানুষটি তাঁর রাজত্বকালে অনেক চুক্তি করেছেন এবং অনেক চুক্তি ভেঙ্গেছেন এবং তার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে বাস্তব পরিস্থিতির যৌক্তিকতা নৈতিকতার থেকে বড় ("... the raison d'etat was above morality ...")। এই বোধকেই পরে সূত্রাকারে প্রকাশ করেছিলেন ইটালীর রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)। তিনি ইউরোপের রাজনীতিতে এই সূত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে লক্ষ্যই হচ্ছে আসল, কোন পথে, কোন মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে তা গৌণ, অর্থহীন। তাঁর রচিত 'দ্য প্রিন্স' (The Prince) নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন ঃ "আমি বিশ্বাস করি যে রাষ্ট্রের জীবনে যদি আশঙ্কা নেমে আসে তবে রাজতন্ত্রই হোক বা প্রজাতন্ত্রই হোক, রাষ্ট্রের সংরক্ষণের জন্য বিশ্বাস ভঙ্গ করবে এবং অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে।" ("I believe that when there is fear for the life of the state, both monarchs and republics, to preserve it, will break faith and display ingratitude.")। দুটি কথা মনে রাখা দরকার। এক, মধ্য যুগ থেকে কূটনীতি বিবর্তিত হয়েছিল দুধরণের পরিবেশের মধ্য দিয়ে, নিদারুণ ধর্মীয় যুদ্ধ ও নগররাষ্ট্রের অবস্থান, আর এই দুইই সরল

এবং সবল কূটনীতির গড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক ছিল না। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সাথে মিশে নগররাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণতা, ষড়যন্ত্রপ্রবণতা, সন্দেহপ্রবণতা ও বিশ্বাসহীনতা ইত্যাদির জটিল ধারা কূটনীতিকে আড়ষ্ট, নির্দয় ও নিষ্প্রাণ করে তুলেছিল। এই পরিবেশ থেকে কূটনীতিকে বাঁড়িয়েছিলেন ওলন্দাজ আইনজ্ঞ ও পণ্ডিত *উগোগ্রোসিয়াস* (Hugo Grotius 1583-1645)। তিনি বলেছিলেন যে ধর্মীয় লড়াই—কে ক্যাথলিক কে প্রট্যোন্ট—এই নিয়ে রক্তক্ষয়ী উন্মাদনায় গিয়ে লাভ নেই, কারণ এর দ্বারা পরস্পরের ঘাতপ্রত্যাঘাত ছাড়া আর কোন ফল লাভ হয় না। তার থেকে মোহাচ্ছন্ন ভাবনা—dogma কে —বাদ দিয়ে যদি শান্ত মনে ভেবে অনুসরণীয় কর্মসূচী ঠিক করে পরস্পরের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করা যায় তবে মানবসমাজের মঙ্গল হবে। এইভাবে শান্ত পরিবেশে সুস্থিত কূটনীতির কথা বল্লেন গ্রোসিয়াস। তাঁর বই *যুদ্ধ ও শান্তি সম্বন্ধে আইনের বিষয়* [De Jure Belli ac Paeis যার ইংরাজী হল Concerning the Laws of War and Peace)[১৬২৫ সালে প্রকাশিত] একটি বিধিসম্মত কূটনীতির পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে ধীরে ধীরে কূটনীতিতে এইসব নিয়ম ও নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রোসিয়াস যে কূটনীতির কথা বলেছেন তার চারটি নীতি প্রধান—(১) যুদ্ধ করতে হবে ন্যায়সঙ্গত কারণে — 'for a just cause' – এবং একান্তভাবে আত্মরক্ষার জন্য ; (২) পরাজিতের ওপর ততটুকু ক্ষতিই চাপিয়ে দেওয়া যাবে যতটুকু শুধু প্রয়োজন; (৩) জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নির্ধারিত হবে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা নয় কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে যেমন একটা ন্যায়ের (justice) দিক আছে সেই রকম রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ন্যায়নীতির একটা দিক থাকে। (৪) একটা সার্বভৌম শাসকের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে চুক্তিপালনের মধ্যে, চুক্তি ভঙ্গের মধ্যে নয়। অতএব একজন শাসক বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন চুক্তিকে সংরক্ষণ করে, শান্তিপূর্ণ আদান প্রদানের পথকে প্রশস্ত করে। এই নীতিগুলিকে জ্ঞানকোষের (Book of knowledge) ভাষ্যকাররা 'counsels of perfection' বলেছেন।

উগো গ্রোসিয়াসের মত আরেকজন ব্যক্তিও সনাতন কূটনীতির ধারাকে পরিশীলিত করেছিলেন। তিনি হলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী কার্ডিনাল রিশলে (Cardinal Richelieu 1585-1642 —উচ্চারণ rêshlyê)। এই কঠিন, নির্দয় ও রাগী মানুষটি কুড়ি বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং তাঁর আমলে ফ্রান্স কূটনীতির নানা সাফল্য অর্জন করেছিল। তিনি তাঁর সমকালীন মানুষদের শিখিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রের স্বার্থই প্রধান ও চিরন্তন এবং তা সমস্ত আবেগ, আদর্শ ও তত্ত্বগত আচ্ছন্নতার ওপরে— "... the interest of the State was primary and eternal; and that it was above sentimental, ideological and doctrinal prejudices and affections.")। তাঁর সমস্ত দূতদের (ambassadors) তিনি শিখিয়েছিলেন যে চুক্তি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রথম পর্যায়ে আলাপ আলোচনা (negotiation), দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাক্ষর (signing of the treaty) এবং তৃতীয় পর্যায়ে অনুমোদন (ratification)—এই তিন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যে দলিল নিশ্চিত হয় তাকে মর্যাদা দেওয়া সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এর পরের কথা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যে সব উপাদান নিয়ে কূটনীতি গঠিত হয় তার সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণটিই হল নিশ্চিতি। রিশলে ক্ষমতায় এসেছিলেন ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময় থেকে ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত একশত ষাট বছর ইউরোপে কূটনীতিক ব্যবস্থা ও আদব-কায়দা যা চালু ছিল তা হল ফ্রান্সের মডেলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। [" ... the diplomatic method of France became the model for all Europe"—Harold Nicolson.]। ফ্রান্সের কূটনৈতিক মডেলটি সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর [জন্ম ১৬৩৮, রাজত্বকাল ১৬৪৩-১৭১৫] সময়ে পরিণতি লাভ করে। মডেলটি এই রকম ঃ

১। কূটনৈতিক কাজের বিস্তার (elaborate diplomatic service)।

২। রোম, ভেনিস, কনস্টান্টিনোপল, ভিয়েনা, হেগ, লন্ডন, মাদ্রিদ, লিসবন, মিউনিক, কোপেনহাগেন, বার্ন ও অন্যান্য বহু অঞ্চলে দূতাবাস স্থাপন—অর্থাৎ দেশে দেশে স্থায়ী দূতাবাস স্থাপন।

৩। প্রয়োজন বোধে দেশে দেশে বিশেষ দূত (Special Missions) প্রেরণ।

৪। দূতদের নিয়মিত আদেশ ও পরামর্শ প্রেরণ (Instruction to ambassadors)

৫। কূটনৈতিক স্টাইলের ওপর গুরুত্ব আরোপ (importance attached to style)

৬। কতিপয়ের দ্বারা কূটনীতি নিয়ন্ত্রণ (diplomacy to be handled by a few) [চর্তুদশ লুই মুক্ত আলোচনায় 'open negotiations' -এর বিরোধী ছিলেন]।

জাতীয় রাষ্ট্র ও নগর রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক আদান-প্রদানের যে সঙ্কীর্ণ মনোভাব, সে সন্দিগ্ধতা, যে প্রতিযোগিতা জর্জর স্বার্থান্বেষণের চেষ্টা তা এসেছিল ইটালির কাছ থেকে। ফ্রান্স দিয়েছিল কূটনীতির প্রকরণ বা পদ্ধতি। চতুর্দশ লুই-এর সময় থেকে ইউরোপীয় কূটনীতিতে ফরাসী প্রভাব প্রধান ও সর্বজনীন হয়ে দাঁড়ায় ["... it was during the reign of Loui XIV that French influence on diplomatic method became predominant and Universal." — Harold Nicolson]

৩.৩.৩ উনিশ শতকে কূটনীতির বৈশিষ্ট্য

ইউরোপের কূটনীতির প্রবহমান ধারা উনিশ শতকে এসে বিভাজিত হল। একটি ধারা হল পবিত্র মৈত্রীর (Holy Aliance) ধারা, আর অন্যটি হল কংগ্রেস ও কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বাস্তব ভিত্তি নির্ণয়ের ধারা ("Two conflicting schemes were put forward which were often confused with each others. Thefirst was that of the Holy Allience, ..." । "The Alliance was followed by a rea attempt in congres and conference to bring about a practical international cooperation ..." —D. M.Ketelbey. A History of Modern Times From 1789 TO THE PRESENT DAY] পবিত্র মৈত্রী (Holy Alliance) চিরায়ত ইউরোপীয় কূটনীতির ধারার মধ্যে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেনি, কিন্তু কিছুটা ধর্মীয় সততাকে সামনে রেখে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে একটি নতুন বন্ধন আনতে চেয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের "সবচেয়ে পবিত্র অক্ষয় ত্রয়ীর নামে" ("in the name of the most Holy and Indissoluble Trinity") ইউরোপের শাসকরা "পবিত্র ধর্মের নিগূঢ় সত্যকে" ("the sublime truths of Holy Religion") তাঁদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কাজে ব্যবহার করার অঙ্গীকার করলেন। তাঁরা জানালেন যে "একটি সত্য ও অক্ষয় সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ ("united in bonds of a true and indissoluble fraternity") ভাইদের মত এবং এক মহৎ খ্রীষ্ট্রীয় জাতির সদস্যরূপে ("like members of one great Christian nations") তাঁরা তাঁদের পরস্পরের সেবায় নিযুক্ত থেকে নিজেদের প্রজাবর্গেরর কল্যাণ সাধন করবেন। শুধু তাই নয় তাঁরা স্বীকার করে নিলেন যে "পৃথিবীতে একমাত্র তিনি (ঈশ্বর) ছাড়া আর কোন সার্বভৌম শাসক নেই—তাঁর কাছেই সমস্ত ক্ষমতা নিমজ্জিত" ("the world has in realiy no other sovereign than Him to whom alone all power really belongs.") ।এই ধরনের ঈশ্বর ও ধর্মভিত্তিক আদর্শবাদ ইতিপূর্বে ইউরোপের কূটনীতিতে আর কখনো এমনভাবে ঘোষিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার ছাড়া আর কোন শাসকই পবিত্র মৈত্রীকে একটা গ্রাহ্য বিষয় বলে মনে করেননি। ইংল্যান্ডের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ক্যাসেলরি (Castlereagh) এই মৈত্রীকে "একটি নিগূঢ় রহস্যবাদ ও নিরর্থকতা" ("a piece of sublime mysticism and nonsence") বলে বর্ণনা করেছিলেন। মেটারনিক (Metternich) [১৭৭৩-১৮৫৯]এই মৈত্রীকে একটি 'উচ্চ ঘোষিত শূন্যতা' ("loud-sounding nothing") বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র মৈত্রীর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় শাসকদের খ্রীষ্টীয় আদর্শে উদ্দীপিত একটি ভ্রাতৃত্বকে ("a brotherhood of sovereigns inspired by Christian ideals") গড়ে তোলা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যা আত্মপ্রকাশ করল তা হল অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর প্রিন্স মেটারনিকের নেতৃত্বে বৃহৎ শক্তিগুলির একনায়কতন্ত্র ("dictatorship of the Great Powers') । ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের

নভেম্বর মাসে রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও গ্রেট ব্রিটেন চতুঃশক্তি মৈত্রী (QuadrupleAlliance) স্বাক্ষর করল। তারপর থেকে ১৮১৮ থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এইক্স-লা-স্যাপেল (Aix-la-Chapelle, ১৮১৮), ট্রোপো (Troppan, ১৮২০) লাইব্যাক (Liabach, ১৮২১) এবং ভেরোনার (Verona ১৮২২) কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ, গণউত্থান, বিপ্লব ইত্যাদি সমস্ত সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বৃহৎশক্তির শাসকরা একটি জোট গড়ে তুললেন। এই জোট হল একটি মহাদেশীয় সংগঠন—ইউরোপীয় জোট (concert of Europe) যার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তির পরিবেশ রচনা করার চেষ্টা হয়েছিল। জাতীয় রাষ্ট্রগুলির দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জনিত দ্বন্দ্বের ফলে কূটনীতিতে যে আন্তর্জাতিক তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হল শক্তি সাম্যের তত্ত্ব (theory of the balance of powers)। ইউরোপীয় জোটের মধ্য দিয়ে নতুন একটি শক্তির সমবায় গঠিত হতে পারত যা ইউরোপীয় কূটনীতিতে শক্তিসাম্যের এক সমান্তরাল ধারণার জন্ম দিতে পারত। কিন্তু ইউরোপীয় জোট ছিল ক্ষণস্থায়ী। ইংল্যান্ডের সরে আসার ফলে এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের ফলে সেই জোট ভেঙ্গে যায়। কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে জোট গড়ার কূটনীতিকে ডেভিড টম্পসন (David Thompson) Europe Since Nepoleon) 'কংগ্রেস কূটনীতি' ('Congress Diplomacy') বলেছেন। এই কূটনীতি শেষ পর্যন্ত মেটারনিক ও ব্রিটেনের অনুসৃত শক্তি সাম্যের নীতির সঙ্গে জার আলেকজান্ডার কথিত পবিত্র মৈত্রীর নীতির মধ্য দিয়ে জোটবদ্ধ হস্তক্ষেপের নীতির পার্থক্যকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করে তুলেছিল ("The only other result of the Congress was to emphasize the continued contrast between the 'balance of power' policies of Metternich and Britain, and the 'Holy Alliance' policies of concerted intervention favoured by Russia"—David Thompson)।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল বিরাট-ফরাসী সামরিকতা (French Militarism) থেকে ইউরোপকে বাঁচাতে হবে এবং উদারনৈতিকতা (liberalism) জাতীয়তাবাদ (nationalism) নামক দুই নবোদ্ভূত বিভীষিকা থেকে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ত্রাণ করে বিপ্লবের বাতাবরণের বাইরে ভিন্নতর সুস্থিতির মধ্যে তাকে পুনর্বাসিত করতে হবে। তাই ইউরোপের কূটনীতির মধ্যে ন্যায়নীতি বা Legitimacy-র কথা জোর দিয়ে বলতে হয়েছিল এবং তার আবরণে কায়েম করতে হয়েছিল রাজতান্ত্রিক শাসনের ইস্তাহার বা কোনভাবেই জনগণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার অনুসারী ছিল না। স্যার হ্যারোল্ড নিকোলসনের (Sir Harold Nicolson) মতকে সমর্থন করে ঐতিহাসিক সিম্যান (L.C.B Seaman, From Vienna to Versailles) বলেছেন যে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত হওয়া কূটনীতিবিদদের সম্বন্ধে প্রথম মতটিকে আমরা বর্জন করতে পারি—তা হলো যে এই কুটনীতিবিদরা কূটনীতির বাজারে ছিলেন ক্ষুদ্রপণ্য বিক্রেতা ভাড়াটে ফেরিওয়ালা যারা লক্ষ লক্ষ জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে সুরভিত হাসির দ্বারা বিকিয়ে দিয়েছিলেন ("mere hucksters in the diplomatic market, batering the happiness of millions with a scented smile.)। আমরা গ্রহণ করতে পারি দ্বিতীয় মতটি যে মত অনুযায়ী ভিয়েনার "কূটনীতিবিদরা রুখে দিয়েছিলেন এক শতাব্দী পরিমাণ সময়ে জন্য একটি বৃহৎ ইউরোপয় যুদ্ধকে' ("they did in fact present a general European Configuration for a whole century of time.")। একদিকে এই বৃহৎ ইউরোপীয় যুদ্ধ ঠেকানোর এবং অন্যদিকে উদারনীতি ও জাতীয়তাবাদের সংক্রামক আদর্শকে রোধ করার ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য নিয়ে উনিশ শতকের প্রারম্ভে কূটনীতি তার যাত্রা শুরু করেছিল। হাতিয়ার হিসাবে নিতে হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ধারণাকে, নিতে হয়েছিল রাজতান্ত্রিক ঐক্যের প্রতিশ্রুতিকে, অগ্রসর হতে হয়েছিল কখনো বা জার আলেকজান্ডারের স্ফটিকস্বচ্ছ আদর্শবাদের পথে, কখনো বা কংগ্রেসের উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে ক্যাসেলরি ও মেটারনিকের প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়াশীল পথে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় কূটনীতিতে এক সর্ব ইউরেপীয় মন গড়ে উঠেছিল। পবিত্র মৈত্রী (Holy Alliance) ইউরোপীয় কূটনীতির মধ্যে এক নৈতিক মনন এনে দিয়েছিল যে নৈতিক মনন পরবর্তীকালে নয়া

কূটনীতির আবির্ভাবের সহায়ক হয়েছিল। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নৈতিকতার উপস্থাপনা এবং একটি ইউরোপীয় বিবেকের উন্মীলন, ঐতিহাসিক লিপসনের ভাষায় শেষ পর্যন্ত পবিত্র মৈত্রীর দান ("The Holy Alliance was nominally, then, an attempt to apply the principles of morality to international diplomacy,in others words to create in Europe a political conscience"—E. Lipson, Europe in the 19th & 20th Centuries.)।

৩.৩.৪ উনিশ শতকের কূটনীতিতে গোপনীয়তার সবিশেষ অভ্যুদয়

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় কুটনীতি দুটি কাজ করে উঠতে পারেনি—এবং পবিত্র মৈত্রীর স্বচ্ছ প্রাণকে একটি শরীরী অবয়বে ঢেকে দিতে ("to provide the transparent soul of the Holy Alliance with a body") পারেনি। আর, দুই উদারনৈতিকতা ও জাতীয়তাবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য যে ইতিবাচক কূটনীতির প্রবর্তন করতে হয় তাকে ভিয়েনার কূটনীতিবিদরা জন্ম নিতে পারেনি। তাঁরা ভিয়েনাতে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তাতে ইউট্রেক্টের চুক্তি (Treatry of Utrectt, ১৭১৩, এই চুক্তির দ্বারা স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হয়েছিল।) বা ভার্সাই চুক্তির মত কোন দেশের বা কোন জাতির অন্তঃকরণে কোন যন্ত্রণার উদ্রেক হয়নি। ইউট্রেক্টের চুক্তি হ্যাপসবার্গদের (Hapsburgs) মনে জ্বালা ধরিয়েছিল এবং তার বাণিজ্যিক শর্তগুলি ভবিষ্যতে ফ্রান্স ও স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস জুগিয়েছিল। ভার্সাইচুক্তি (১৯১৯) জার্মানিকে নির্মমভাবে আঘাত করেছিল এবং নিজের জঠরে আরেকটা বড় যুদ্ধের বীজকে ধারণ করে রেখেছিল অত্যন্ত সংগোপনে। সে অর্থে ভিয়েনার কূটনীতি কোন বড় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে উৎসাহ দেয়নি, কিন্তু সে যা করেছিল তা হল প্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে ভিয়েনার কূটনীতিকরা সময়ের ঘড়িকে পিছিয়ে দিতে চাননি, তাঁরা পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর জন্য তাকে ১৮১৫ তেই আটকে রাখতে চেয়েছিলেন ("The fault of the Vienna statesmen is not that they put the clock back in 1815 ... their error was that they hoped to keep teh clock stopped at 1815 for the next half a century"–L.C.B.Seaman, From Vienna to Versailles)। কিন্তু ঘটনার প্রবাহ এগিয়ে গিয়েছিল থেমে থাকেনি। তাই একটা পর্যায়ের পর—মূলতঃ ১৮৭০ এর পর-ইউরোপের কূটনীতিকে দ্রুত বদলাতে হয়েছিল পরিবর্তনশীল ঘটনার প্রবাহের সঙ্গে তাল রাখার জন্যে। ১৮৭০ সালে শেষ হয়েছিল ইতিহাসের একটা অধ্যায় যে অধ্যায়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনশীল আন্দোলন (formative movements) পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। আর তার থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য, ইটালীর ঐক্যবদ্ধ রাজা, তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ও দ্বৈতরাজতন্ত্র (Dual Monarchy)। এর মধ্যে জার্মানিই ছিল ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি শক্তিশালী সামরিক সাম্রাজ্য। ঐক্যবদ্ধ হলেও এ সাম্রাজ্য তখন পর্যন্ত ছিল একটি ভ্রূণের মত অপরিণত। এর একটি একাগ্র রাজনৈতিক সত্তা তখনও সৃষ্টি হয়নি ("But as yet the new state existed only in an embryonic form. It lacked a corporate political existence"—Lipson)। এদিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘটনা থেকে এ সাম্রাজ্যে এসেছিল নতুন বিপন্নতা। ফ্রান্সকে পরাজিত করে (সেদানের যুদ্ধে ১৮৭০ সালে) তার কাছ থেকে আলসাস-লোরেন (Alsace-Loeraine) কেড়ে নিয়ে জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। সেদানের যুদ্ধের পরাজয়কে ফরাসীরা শেষ কথা, ইতিহাসের অপরিবর্তনীয় রায় বলে মেনে নেয়নি। এ কথাও মেনে নেয়নি যে আলসাস-লোরেনের হস্তচ্যুতি একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। এর পর থেকে ফরাসীদের অন্তরের অদম্য কথাটি হল revanche—প্রতিশোধ। আলসাস-লেরেন জার্মানির কাছে হয়ে দাঁড়াল ফরাসী বন্ধক (French Mortgage)। একজন জার্মান ঐতিহাসিক লিখেছেন যে "শুরু থেকেই জার্মান সাম্রাজ্যের কাঠামো একটি ফরাসী বন্ধকের দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল কারণ যে কোন বিদেশী শত্রু এর পর থেকে নিঃশর্তভাবে ফরাসী সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পারত ("from the very outset the new structure of the German Empire

was burdened as it were by a French mortgage, since every foreign foe could henceforth reckon unconditionally on French support.")। ফ্রান্সে তখন প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। সেখান থেকে বিপ্লবের হাওয়া এসে জার্মানির রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাজনো বাগানকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারত। বিসমার্ক তাই বলেছিলেন, "আমরা চাই ফ্রান্স আমাদের শান্তিতে থাকতে দিক" ("We want France to leave us in peace."। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই—যে করেই হোক ফ্রান্সকে নিঃসঙ্গ রাখতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে যতদিন না ফ্রান্স তার মিত্রকে খুঁজে পাবে ততদিন সে জার্মানির কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না।" ("As long as France has no allies she is not dangerous to Germany.") অতএব তাঁর লক্ষ্য হল একটাই—"ফ্রান্সকে বন্ধু পাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে" ("We have to prevent France finding an ally.")।

বিসমার্কের এই উদ্দেশ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল গোপন কূটনীতি। তিনি অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া উভয়কেই এ কথা বোঝাতে পেরেছিলেন যে প্যারিস কমিউন, জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাসি এবং নিহিলিজম (রাশিয়াতে আবির্ভূত ধ্বংসের দর্শন) ইউরোপে সব রাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। এর থেকেই জন্ম নিয়েছিল ড্রেই কাইজার বান্ড বা তিন সম্রাটের লীগ (League of three Emperors, 1872), অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রী (Austro German Alliance, 1879) এবং ত্রিশক্তির মৈত্রী (Triple Alliance, ১৮৮২)। মনে রাখতে হবে যে স্ল্যাভ রাশিয়াকে আড়াল করেই অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রী সম্পাদিত হয়েছিল আর রাশিয়া মনে করেছিল যে এই মৈত্রী ও ১৮৭৮ সালের বার্লিন কংগ্রেসে জার্মানির ভূমিকা নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর মাত্র। কারণ, ১৮৭০ সালে ফরাসী-জার্মান লড়াইয়ের সময় রাশিয়া জার্মানিকে সমস্ত রকম সাহায্য দিয়েছিল। এবার জার্মানিও গোপনে রাশিয়ার কাছে থেকে সরে গেল। গোপন কূটনীতির ফলে জার্মান ভাষাভাষী মানুষরা নিজেদের সংহতি রচনা করল ঠিকই কিন্তু রাশিয়ার স্ল্যাভরা ঝুঁকে পড়ল ফ্রান্সের দিকে। এরপর থেকে রাশিয়ার স্লোগান হল 'আমরা শক্তিশালী ফ্রান্স চাই' ("We need a powerful France")। ট্রিপলক এ্যালায়েন্সের মুখোমুখি রাশিয়া-ফ্রান্স-ইংল্যান্ডের ট্রিপল আঁতাতের সূত্রপাত এইখানেই। গোপন কূটনীতি সারা ইউরোপকে দুটি সশস্ত্র শিবিরে (armed camp) বিভক্ত করে ফেলে আর তার থেকেই দেখা দিল বিশ্বযুদ্ধ। ১৮১৫ সালে ভিয়েনার চুক্তি যে মহাদেশব্যাপী যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রেখেছিল গোপন কূটনীতি সেই যুদ্ধের দ্বারা অবারিত করে দিল। প্রথম আলেকজান্ডার-স্ল্যাভ রাশিয়ায় জার যে রাজতান্ত্রিক ঐক্যকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন সেই একইরকম প্রতিক্রিয়াশীল ঐক্য বিসমার্কও গড়ে তুললেন তাঁর তিন সম্রাটের লীগের মধ্য দিয়ে। শুধু তফাৎ এই যে জারের পরিকল্পনায় খ্রীষ্টীয় নৈতিকতা ছিল, আর বিসমার্কের ব্যবস্থা ছিল একান্তভাবে বাস্তবতা-নির্ভর নৈতিকতা বিবর্জিত এক সংগোপন তৎপরতা মাত্র। সন্দেহ আর আক্রোশ, প্রতিশোধ স্পৃহা আর অনৈতিকতার আলিঙ্গন এই সবই ছিল গোপন কূটনীতির অন্তর্নিহিত পরিচালিকা শক্তি। এ সমস্ত কিছু থেকে জন্ম নিয়েছিল এক নির্দয় রণপ্রস্তুতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তারই পরিণাম।

৩.৩.৫ নয়া কূটনীতির জন্ম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংস থেকে মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে গোপন কূটনীতি মানুষের সভ্যতার পক্ষে কত ভয়ঙ্কর। তাই গোপন কূটনীতিকে পরিহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় থেকে। ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন যুদ্ধের পর শান্তির বনিয়াদ কি হবে তা আলোচনা করতে গিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের সামনে একটি বক্তৃতায় চৌদ্দ দফা শর্তের কথা বলেছিলেন। পরে এইটিই ইতিহাসে Fourteen Points বা চৌদ্দদফা শর্ত বলে বিখ্যাত হয়। এই শর্তাবলীর প্রথম শর্তই হল 'খোলাখুলিভাবে উপনীত শান্তির খোলা ইস্তাহর'—"Open Covenants of peace, openly arrived at". এই শর্তের মধ্য দিয়ে এইভাবে মুক্ত কূটনীতির ঘোষণা করা হল। এই মুক্ত কূটনীতিই হল নয়া কূটনীতি। এর দ্বারা যে শুধু গোপন কূটনীতির মূলোচ্ছেদের চেষ্টা হল তা নয়, ইউরোপের হাজার

বছরের কূটনীতির অন্তর্নিহিত যে ভাব-রেষারেষি, সন্দেহ, প্রতিযোগিতা, গোপন তৎপরতা—তাকেও বাতিল করার চেষ্টা হল। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) তাঁর চতুর্থ শর্তে বলেছিলেন যে গার্হস্থ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রত্যেক জাতি তার অস্ত্রশস্ত্র ও সমর সরঞ্জামকে ন্যূনতম বিন্দুতে কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেবে— 'Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety"। গোপন কূটনীতি ও গোপন রণপ্রস্তুতি যে গাঁটছড়া বেঁধে চলে আর তার ফলে যে সন্দেহ ও হানাহানি বৃদ্ধি পায় একথা জেনেই রাষ্ট্রপতি উইলন সমরসম্ভার কমাতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি জানতেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পেছনে উপনিবেশ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শক্তিশালী জাতিগুলির লোভাতুর মনে কি ভীষণ আক্রোশের সঞ্চার করেছিল। তাই তাঁর পঞ্চম শর্তে তিনি ডাক দিলেন স্বাধীন ও খোলা মনে এবং চরম পক্ষপাতশূন্যতার মধ্য দিয়ে সমস্ত ঔপনিবেশিক দাবীর মীমাংসা করতে হবে— "A free, open-minedd and absolutely impartial adjustment of all colonial claims." এইভাবে যুক্তির নতুন বোধের মধ্যে পৃথিবীর কূটনীতিকে বসানোর চেষ্টা হল। এত ব্যাপকভাবে, এত প্রকাশ্যে এবং এত জোরের সাথে খোলামেলা কূটনীতির কথা এর আগে আর আলোচিত হয়নি। কূটনীতি সম্বন্ধে এই খোলামেলা ভাবনাকেই নয়া কূটনীতি বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক কথায় নয়া কূটনীতি হল খোলা কূটনীতি —Open diplomacy।

বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ হার্টম্যান (Fredrick H. Hartmann, The Relations of Nations) বলেছেন যে "গোপন" (secret) কূটনীতি থেকে "খোলাঠ (open) কূটনীতিতে উত্তরণ বর্তমান কালের একটি বড় ঘটনা। 'গোপন' কূটনীতি আর 'খোলা' কূটনীতির তফাৎটা এখানে বোঝা দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত কোন দেশের বৈদেশিক নীতির অন্তরালে যে কূটনৈতিক তৎপরতা চলত তা সে দেশের মানুষ জানতে পারত না। বড় বড় শক্তিগুলি যে কূটনীতির চালু করেছিল তাতে গোপনে যুদ্ধের তৎপরতা চলত, অঙ্গীকার, প্রতি-অঙ্গীকার, দাবী, প্রতিবাদী সব মিলে মিশে যে পরিবেশ তৈরি করত তাতে জনগণের কোন ভূমিকা থাকত না। এইভাবে জনগণ জানতেও পারেনি ক্রমশঃ তারা দেশে-দেশান্তরে একটা বড় যুদ্ধের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। এক কথায়, হার্টম্যান লিখছেন, অভিযোগটা হল এই রকম যে জনগণের সম্মতি ছাড়াই জনগণকে যুদ্ধে লিপ্ত করা হয়েছে ("In short, the argument was that the people had been committed to war–without this consent"–Hartmann) ।এই অনুভূতি এসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তাই হার্টম্যান লিখেছেন — "The shift from 'secret' to 'open' diplomacy followed World War I"। 'গোপন' কূটনীতি থেকে খোলা' কূটনীতিতে উত্তরণ ঘটেছিল ঠিক সেই সময়ে যখন জাতিসংঘ বা লীগ অফ নেশসন (Legue of Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু লীগ অফ নেশনস্ ছাড়াই হয়ত এর আবির্ভাব ঘটত। কারণ জনগণ বুঝতে শিখেছিল যে তাদের না জানিয়ে তাদের যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ("Open diplomacy had come into fashion because of widespread popular feeling that the serect intrigues of the Powers, carefully concealed from their own peoples, had led to a war over obligations, promises, and counterclaims that would not have stood the light of public scrutiny"–Hartmann গোপন কূটনীতির উদ্দেশ্য কি ছিল শুধুই নিজেদের ষড়যন্ত্রকে জনগণের কাছ থেকে আড়াল করা? হয়ত তার থেকেও কিছু বেশী—শত্রুর কাছ থেকে তথ্য গোপন করাও ছিল কূটনীতিবিদদের একটা বড় উদ্দেশ্য ("The reason the treaties and agreements were almost always 'secret' was not to keep their own people in ignorance but to prevent too much useful information on war plans from being revealed to the enemy"–Hartmann) । এ কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে গোপনীয়তা কূটনীতির অন্তর্নিহিত বিষয়। খোলা কূটনীতি সূচিত হওয়ার পরেও কূটনীতি যতখানি খোলা হওয়া উচিত ছিল ততখানি হতে পারেনি। হার্টম্যান (Hartmann) বলেছেন যে বস্তুতপক্ষে খোলা কূটনীতির পরবর্তী অধ্যায়েও কূটনীতি কখনোই সে অর্থে খোলা হতে পারেনি যে তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গোপন তথ্যই জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া

হত। যা হয়েছিল তা হল এই যে কূটনীতির প্রক্রিয়া অনেক বেশী জনগণের কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল ("As a matter of fact, even in the subsequent period of open diplomacy, diplomacy was never open in the sense that all secrets were publicy revealed, but only in that the process of negotiation itself became more public"—Hartmann)।

খোলা কূটনীতির যে ধারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আত্মপ্রকাশ করেছিল তার সবচেয়ে বড় ইঙ্গিতবাহী অভিজ্ঞান হল লীগ অফ নেশনস বা জাতিসংঘের সনদ (League Covenant)। এই সনদের ১৮নং ধারায় বলা হয়েছিল যে, যে কোন লীগ সদস্যকৃত চুক্তি বা আন্তর্জাতিক তৎক্ষণাৎ নথিভুক্ত করতে হবে—লীগ চুক্তিপত্রের ভাষায় "Every treaty or international engagement ... by any Member of the League" was to be registered "forthwith"। তার পরে লীগ সেক্রেটারির দপ্তর (secretariat) তা ছাপবে। কোন চুক্তি এইভাবে নথিভুক্ত না হলে তা গ্রাহ্য—আইনের ভাষায় binding—হবে না।

লীগ চুক্তিপত্রের এই ১৮নং ধারার ফল হয়েছিল এই যে ১৯১৯ সালের পর থেকে প্রায় সমস্ত চুক্তি একটা সাধারণ ও সরল বয়ানে লিখিত হত। তার ভেতরের জটিলতাগুলিকে পরে কূটনৈতিক নোট চালাচালি ও নানা লিখিত কথায় আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে স্থির করা হত, আর সেগুলি প্রায় গোপনই থাকত। খোলা কূটনীতির উদযাপনে লীগ চুক্তিপত্রের ১৮নং ধারাকে যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত ততখানি গুরুত্ব ধারণ করতে পেরেছিল কি না বলা কঠিন। এই ১৮ নং ধারা প্রতিপালিত না হলে কোন চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি কমে যেত এমন ভাবা সঙ্গত নয়। কারণ চুক্তি দুই বা একাধিক দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের গ্রাহ্য বিষয়, তা সর্বজনীনভাবে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। এই শর্ত প্রতিপালিত না হলে কোন চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি বিনষ্ট হত না। অর্থাৎ খোলা কূটনীতিকে যতটা বাস্তব ও কার্যকরী মনে করা হত তা হয়ত শেষ পর্যন্ত তা ছিল না। তা যদি না হয়ে থাকে তবে খোলা কূটনীতিকে এত সমাদর করা হয় কেন? আসলে গোপন কূটনীতি থেকে খোলা কূটনীতিতে রূপান্তরের ফল যা হয়েছিল তা কূটনীতির অন্তর্নিহিত ভাবের মধ্যে ততটা প্রকাশ পায়নি যা পেয়েছিল কূটনীতির প্রক্রিয়ার মধ্যে। হার্টম্যান (Hartmann) বলেছেন যে খোলা পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে কূটনীতির মধ্যে যে পরিবর্তন এল তা পাওয়া যাবে আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়ার মধ্যে, তাকে পাওয়া যাবে উইলসনীয় চতুর্দশ শর্তের (Fourteen Points) সেই শর্ত প্রতিপালনের মধ্যে যাতে বলা হয়েছে যে কূটনীতি অগ্রসর হবে মুক্তভাবে এবং জনগণের জ্ঞাতসারে ("The real changes in diplomacy that resulted from the adoption of 'open' methods were to be found in the negotiating process itself, in the attempt to implement the Wilsonian principle of the Fourteen Points that 'diplomacy shall proceed always frankly and in the public view.')। হার্টম্যান আরও বলেছেন যে এই শর্ত কূটনীতিকে অসার করে দিয়েছিল —This principle almost wrecked diplomacy on the shoals of impotence। আক্ষরিকভাবে দেখতে গেলে এই শর্তের অর্থ হল আলাপ-আলোচনাকে জনগণের জ্ঞাতসারে করতে হবে এবং একবার জনগণের জ্ঞাতসারে করার অর্থই হল জাতীয় সম্মান তার দ্বারা জড়িত হয়ে পড়ল ("Taken literally ... negotiation must then be public, And once negotiation became public, national prestige inevitably became involved"—Hartmann)। এই দিক থেকে দেখতে গেলে খোলা কূটনীতি বাহ্যত বেশ কার্যকরী হয়েছিল। অন্তত কূটনৈতিক দেওয়া নেওয়ার পেছনে জনগণের সতর্ক নজর যে জাগ্রত প্রহরীর মত কাজ করতে পারে এবং তার দ্বারা যে পৃথিবীর শান্তি রক্ষিত হতে পারে এই বোধকে কূটনীতির উন্মুক্ত হওয়ার তত্ত্বের মধ্যে মেনে নেওয়া হয়েছিল।